ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন ঃ বিশ্ব রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

*মোঃ জানে আলম।

পটভূমি ঃ

মানুষের অপরিমেয় ও অভাবনীয় কীর্তিগাঁথা বুকে ধারন করে বিশ্বসভ্যতা যখন একবিংশ শতাব্দীর দ্বার -প্রান্ত অতিক্রম করছে এবং বিশ্বের শান্তিপ্রিয় প্রগতিকামী মানুষ যখন আরো পিলেচমকানো অর্জনের প্রত্যাশার সোনালী প্রহর গুণছে, ঠিক তেমনি এক মহার্ঘ্যক্ষণে যে ঘটনাটি মানবজাতির সকল স্বপ্নসাধ ও অর্জনের নির্মল অহংবোধ গুঁড়িয়ে ধূলায় মিশিয়ে দিল, তাহলো ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন। হাজার বছরের সভ্যতার অর্জনসমূহ--গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, স্বাধীনতা, শ্রেয়োবোধ, ন্যায়বোধ, মৌলিক অধিকার--ইত্যাকার আধুনিক মূল্যবোধগুলোকে এক লহমায় অন্তঃসারশূন্য করে--জোর যার মুলুক তার (Might is right)-- সে আদিযুগের দর্শনে যেন আমরা ফিরে গেলাম। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো, যে সকল বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাগ্রসর দেশকে এ সব মূল্যবোধের সূতিকাগার বলে সাধারণ মানুষ মনে করত--যাদের জনগণের শতাব্দীব্যাপি আন্দোলন সংগ্রাম, রেঁনেসার মাধ্যমে মাধ্যমে উপরোক্ত আধুনিক মূল্যবোধগুলোর জন্ম ও বিকাশ--বীভৎস এ আঘাতটি আসল তাদের পক্ষ থেকেই। কোন এক অশুভ প্রাতে নিদ্রা ভেঙ্গে উঠে হঠাৎ নিজেকেই নিজের কাছে বিষম অপরিচিত মনে হতে লাগল। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল-- আমরা এ কোন যুগের বাসিন্দা ? একি আধুনিক যুগ? নাকি নিমিষে সময়ের চাকা উলটো ঘুরে আমাদের সে বর্বর মধ্যযুগে নিয়ে গেল ? ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ, নির্বিচার শিশু ও নারী হত্যা দেখে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ আজ বেদনায় বিমর্ষ, বিবেকী তাড়নায় বিচলিত, অপশক্তির দানবীয় হুংকারে বড় বিপন্ন। কিন্তু তার চেয়ে যে বড় ক্ষতিটি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ করেছে তাহলো, বিশ্বের তাবৎ মানুষের কাছে--বিশেষভাবে অনুন্নত বিশ্বের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর কাছে-- হাজার বছরের সভ্যতার অর্জন, আধুনিক মূল্যবোধগুলোকে অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরতায় পর্যবসিত করা--পশ্চাদপদ ধ্যানধারণা আক্রান্ত মানুষদের--গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতায় আস্থাহীন মানুষদের উস্কে দেওয়া-- যে ক্ষতি সহজে পূরণ হবার নয়। আজ যদি কেউ প্রশ্ন তুলে--গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে খ্যাত সেই মার্কিন মুলুক, যার এক মহান নেতা আব্রাহাম লিংকনের বক্তৃতা থেকে আমরা গণতন্ত্রের ধ্রূপদী সংজ্ঞা প্রদান করে "Government of the people for the people by the people" বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলি, সেদেশের সরকার যদি সমগ্র বিশ্ব জনমতকে তোয়াক্কা না করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে দখল করে নেয়, তখন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ? হাজার হাজার মাইল দূরের একটি অনগ্রসর দেশকে নিজের নিরাপত্তার জন্য হুমকী বলে চিহ্নিত করে একটি পরাশক্তি যদি সে দেশে সামরিক হামলা চালিয়ে অগুনিত নারী পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে, তখন মানবতাবাদ বলে কিছু কি অবশিষ্ট থাকে ?

এখন মৌলিক প্রশ্ন হলো--এ আগ্রাসনের মর্মগত কারণ কী(Essence of the phenomenon) ।

মানব সভ্যতাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র থেকে রক্ষা করা?

ইরাকের স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানো ?

ইরাকের জনগণকে স্বাধীন করা?

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাবী মতে উপরোক্ত উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব হলো--হ্যাঁ।

নাকি ইরাকের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করা?

ইরাক আগ্রাসনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হলে সর্বাগ্রে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজে পেতে হবে।

ইরাকের মাটির নীচে তরল সোনা ঃ

বিশ্বে শক্তির প্রধান উৎস এখনো জ্বালানী তেল। তাই সম্প্রতি তেল বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বে তেল উৎপাদনকারী দেশের সংখ্যা প্রায় ১০২ টি। তৎমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বিশ্বের সিংহভাগ তেল উৎপাদন করে থাকে। ইরাক বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। প্রথম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরবের নিশ্চিত তেলের মওজুদ হলো ২৬১ বিলিয়ন ব্যারেল। ইরাকের নিশ্চিত মজুদের পরিমান ১১২ বিলিয়ন ব্যারেল। সংযুক্ত আরব আমীরাত, কুয়েত, ইরান, ভেনিজুয়েলা এবং রাশিয়ার নিশ্চিত মজুদ ইরাকের চেয়ে কম। সর্বশেষ তথ্যানুসারে বিশ্বে নিশ্চিত তেলের মজুদের পরিমান হলো ১ ট্রিলিয়ন ব্যারেল। সুতরাং ইরাকের নিশ্চিত মজুদ বিশ্ব মজুদের ১১ শতাংশ। ইরাকের তেলের গুণগত মান বিশ্বের সেরা, যা প্রতি ব্যারেল উত্তোলন খরচ সর্বনিম্ন মাত্র ২ থেকে ৩ ডলার, পরিশোধন খরচ মাত্র ৯৭ সেন্ট। তাছাড়া সালফারের পরিমাণ খুব কম হওয়ায় ইরাকী তেল পরিবেশ বান্ধবও বটে।

ফেব্রুয়ারী, ২৮, ২০০৩ ইং এর ফ্রন্ট লাইন পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়-- বিশ্বে তেলের দৈনিক চাহিদা হলো প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ব্যারেল এবং এ চাহিদা বৎসরে ২ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকা বর্তমানে তার চাহিদার ৫২ শতাংশ আমদানী করে মধ্যপ্রাচ্য, মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা এবং কানাডা থেকে এবং ২০২০ সাল নাগাদ এ আমদানীর পরিমান প্রায়

দুইতৃতীয়াংশে উন্নীত হবে। কৌশলগত মজুদ হিসাবে আমেরিকা প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুদ রেখেছে এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যায়ে আমদানী সম্ভব বলে আমেরিকা তার অনেক তেল ভূ-গর্ভ হতে উত্তোলন করা থেকে বিরত রয়েছে।

১২ টি শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশের তেল মজুদের একটি লেখ চিত্র।

দেশের নাম	তেলের নিশ্চিত মজুদ বিলিয়ন ব্যারেল।	দেশের নাম	তেলের নিশ্চিত মজুদ বিলিয়ন ব্যারেল
সৌদি আরব	২৬১.৫	রাশিয়া	৪৮.৬
ইরাক	১১২.৫	মেক্সিকো	৪৭.৮
সংযুক্ত আরব আমীরাত	৯৭.৮	লিবিয়া	২৯.৫
কুয়েত	৯৬.৫	চায়না	২৪.০
ইরান	৮৯.৭	নাইজেরিয়া	২২.৫
ভেনিজুয়েলা	৭২.৬	আমেরিকা	২১.০

আমেরিকা শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থান করলেও ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে তার অবস্থান বিশ্বে সর্বশীর্ষে। আমদানীর অবাধ সুযোগ না থাকলে তার নিজস্ব মজুদ সহসা ফুরিয়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো একারনে বরাবরই আমেরিকার জিও পলিটিক্স এর শিকার। আমেরিকায় তেল সরবরাহকারী প্রধান দেশগুলোর মধ্যে ভেনিজুয়েলা অন্যতম। তেলকূপ জাতীয়করনের প্রশ্নে সে দেশের জনপ্রিয় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট উগু চ্যাভেজ আমেরিকার স্বার্থের জন্য হুমকী হয়ে গেলে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে সংঘটিত হয় সাকরিক কূ্য। কিন্তু ভেনিজুয়েলার বীর জনগণ সে সামরিক অভ্যূত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়ে পূনঃ ক্ষমতাসীন করেছে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে, বিগত ১৩ ই অক্টোবর, ২০০২ ইং তারিখে; যা স্পষ্টতঃই আমেরিকার তেল প্রাপ্তির একটি উৎসকে অনিশ্চিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবই আমেরিকার প্রধান তেল সরবরাহকারী। রাজতন্ত্র, লাদেন সংশিষ্টতা ইত্যাদি কারনে আমেরিকা আর সৌদি আরবের উপর পুরাপুরি আস্থা রাখতে পারছেনা। মধ্যপ্রাচ্যে তার এমন বিকল্প দরকার, যে বিকল্পদেশের সরকার হবে তারই শিখন্ডি। বাস্তবতা হলো মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল দেশ ইতোমধ্যে আমেরিকার কাছে নতজানু হয়েই আছে। এ অবস্থাকে সে যে কোন প্রকার হুমকী থেকে মুক্ত রাখতে চায়। এক্ষেত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে একমাত্র ইরাকের সাদ্দাম হোসেন । জাতিসংঘ আরোপিত এক যুগের অর্থনৈতিক অবরোধে এমনিই দেশটি কাহিল হয়ে আছে। বিশ্বে কোন বড় শক্তি তার সমর্থনে নেই এবং '৯১ এ যুদ্ধের পর যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাও জাতি সংঘের অস্ত্র পরিদর্শকেরা ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে। দেশটির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণের একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অতএব সামরিক হামলা পরিচালনার জন্য সর্বাপেক্ষা যুৎসই অবস্থায় আছে ইরাক। যুক্ত রাজ্যের রবিবারের পত্রিকা, The Observer, November3, 2002 এ "Carve-up of oil riches begins" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, The leader of the London-based Iraqi National Congress, Ahmed Chalabi, has met executives of three US oil multinationals to negotiate the carve-up of Iraq's massive oil reserves post-Saddam."---" Although Russia, France and China have existing deals with Iraq, Chalabi has made clear that he would reward the US for removing Saddam with lucrative oil contracts, telling the Washington Post recently;'American companies will have a big shot at Iraqi oil; Indeed, the issue of who gets their hands on the world's second largest oil reserves has been a major factor driving splits in the security council over a new resolution on Iraq-----As of last month, Iraq had reportedly signed several multi-billion dollar deals with foreign oil companies, mainly from China, France and Russia." ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি জার্নাল এর ডিসেম্বর, ২০০২ ইং সংখ্যায় এর এক প্রতিবেদনে লেখা হয়, " the US state department is reported to be holding a meeting this month with Iraqi opposition members on the future of the country's oil and gas sector once Saddam is gone. A working group - said to include some officials who have defected from the Iraqi oil ministry- is expected to make recommendations to any transnational government on how to rehabilitate the energy sector." প্রতিবেদনে আরো বলা হয়,, "Oil seems to be a core reason for the US to get rid of Saddam but it is not the only factor." এসমস্ত তথ্য প্রমাণ থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইরাক দখলের জন্য দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিল আমেরিকা। একইভাবে পূর্বপরিকল্পনা ছিল আফগানিস্তান দখলের। লাদেন ছিল

নিছক ছুতো। তাই লাদেনকে আমেরিকা আজ আর খুঁজছেনা । সারা দুনিয়ার মিডিয়া বলছে লাদেন এখনো জীবিত। অথচ তাকে ধরার অজুহাতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আফগানিস্তানে হামলা করে আমেরিকা কত লক্ষ নারী, শিশু ও গণমানুষকে খুন করেছে তার হিসাব কখনো বিশ্ববাসী জানবেনা । একটি শিখন্ডি সরকার ক্ষমতায় বসিয়ে ২৫০০ কিলোমিটারের গ্যাস পাইপ লাইন বসানোর কাজটি সম্পন্ন করাই ছিল আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য । অন্যথায় বিকল্প পাইপ লাইনের দূরত্ব হত ৫৫০০ কিলোমিটার। বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ আজ বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, সন্ত্রাস, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এসব কিছু নিয়ে আমেরিকা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়, আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী এসবে আদৌ বিশ্বাসও করেনা। তার মাথা ব্যাথা বিশ্বের সম্পদ এবং সে সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে নিরঙ্কুশ মাতব্বরী (Absolute Hegemony) এবং সাম্প্রতিক সময়ে তার মূল লক্ষ্য শক্তির প্রধান উৎস জ্বালানী তেল । তাই ইরাকে এ আগ্রাসন।

ইরাকে যুদ্ধের আপাতঃ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে একটি পারমানবিক শক্তিধর দেশ আরো কয়েকটি শক্তিশালী দেশের সাথে আঁতাত করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশকে বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিয়ে, তার অসংখ্যক নারী শিশু ও গণমানুষকে হত্যা করে তা দখল করে নিয়ে আত্মম্ভরিতায় গলা হাঁকিয়ে বলছে আমরা দেশটাকে মুক্ত করেছি !! কি অদ্ভূত ভন্ডামী ! অথচ সে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শত সহস্র বিপন্ন, হৃতসর্বস্ব ও অনাহারক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ (যাদের নাকি মুক্ত করা হয়েছে ?) প্রতিদিন রাজপথে শ্লোগান দিচ্ছে--মার্কিনীরা ইরাক ছাড়ো ! আর মার্কিনীরা বলছে আমরা তোমাদের মুক্তি দেব, গণতন্ত্র দেব। এর চেয়ে বেহায়াপনা আর কী হতে পারে ? সে স্বঘোষিত মুক্তির দূত'রা(!) ইতোমধ্যেই ইরাকের মূল্যবান তেল সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া শুরু করেছে।

বস্তুতঃ নয়া-ঔপনিবেশিক কায়দায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বের প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী ইতপূর্বেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অতীতে সে কাজটি করতে গিয়ে অন্ততঃ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের একটি মুখোশ পড়ে থাকার চেষ্টা করত। যার ফলে বিশ্বের অতি সাধারণ মানুষের কাছে তার শোষণ প্রক্রিয়া এতটা স্পষ্ট কখনো ছিলনা । কিন্তু তেল সম্পদের লোভে এবার সে এত মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, ইরাকে নগ্ন হামলার জন্য সে মুখোশটুকু ও সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সৃষ্ট নজিরবিহীন বিশ্ব জনমতকে তোয়াক্কা না করে, জাতি সংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে সে ইরাকে হামলা করল এবং ইরাক দখল করে নিল । যার ফলে বিশ্বের ডান বাম সর্বমহলে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটা নগ্ন হয়ে ধরা পড়ল । কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের একটু পেছনে যাই, তখন দেখতে পাব আমেরিকার এ ভূমিকা নোতুন কোন বিষয় নয়। এ আমেরিকা নিজ দেশের ছাত্রদের সাথে খারাপ ব্যবহারের অজুহাতে--যেখানে সে ছাত্ররাই এ অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবী করছিল--দখল করে নিয়েছিল গ্রানাডার মত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। সে ঘটনার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, এ ঘটনা আমার সকালের নাস্তা গ্রহণেও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। এ আমেরিকা পানামার প্রেসিডেন্ট নরিয়েগাকে মাদক ব্যবসার অভিযোগে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল নিজ দেশে, অতঃপর তাকে বিচারের প্রহসন করে এখনো কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে আমেরিকায়। ভিয়েতনাম, কিউবা, নিকারাগুয়া, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, হাইতি, গুয়েতেমালা, কঙ্গো সহ তৃতীয় বিশ্বের যে দেশে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম দানা বেধেঁছে, সে দেশেই আমেরিকা হয়ত নিজের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে নতুবা নির্বাচিত জাতীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যূত করার মাধ্যমে তাদের জাতীয় নেতাকে হত্যা করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নস্যাৎ করার চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করেছে । আমাদের দেশে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী যখন নির্বিচারে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ করে যাচ্ছিল, তখন এ আমেরিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ-বহর পাঠিয়েছিল পাকিস্তানীদের রক্ষা করার জন্য। সেদিনের মহান সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে না দাঁড়ালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারত, তা ভাবতে আজ শিউরে উঠতে হয়।

আমেরিকার সে চিরায়ত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সর্বশেষ শিকার ইরাক দখলের মাধ্যমে বস্তুতঃ নোতুন করে যা বুঝানো হল, তাহলো প্রয়োজনে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের আলখাল্লা খুলে ফেলে রাজ্য দখলের সে মধ্যযুগে ফিরে যেতে ও পিছপা হবেনা। আরো একটি ক্ষেত্রে অনেকের মোহ ভঙ্গ ঘটেছে। বিখ্যাত ওয়েস্ট মিনিষ্টার গণতন্ত্রের দেশ বৃটেন, ১২২ জন স্ব-দলীয় এমপির প্রচন্ড বিদ্রোহ, কতিপয় মন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নিজ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের তীব্র বিরোধীতা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে এ অযৌক্তিক আগ্রাসী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলনা। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের যুদ্ধ বিরোধী মিছিল সমাবেশ ও স্বদেশে লক্ষ মানুষের বিরোধীতা যুদ্ধবাজ বুশকেও একটু বিচলিত করলনা। তাহলে কোথায় তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ? এ সমস্ত পরাশক্তিধর দেশগুলোর নিজস্ব সমাজে উদারনৈতিক গণতন্ত্র, মানবতাবাদ এর যে জয়গাঁথা বিশ্ববাসী শুনে আসছিল, সেটা যে কত অন্তঃসারশূন্য তা আজ বিশ্ববাসীর কাছে নগ্ন ভাবে ধরা পড়ল। হাজার হাজার টন বোমার আঘাতে ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নির্দোষ নারী শিশু ও গণমানুষের নির্বিচার হত্যাকান্ডে যাদের বুক এতটুকু কাঁপেনা তাদের মানবতাবাদ কি হিংস্র দানবকেও লজ্জা দেবেনা ?

পুনরুক্তি হলেও যে কথাটি বলতে হয়--ইরাকে এ বর্বর আগ্রাসনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যে মারাত্নক বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করেছে, তা শুধু প্রাসাদোপম অট্টালিকা সুশোভিত বাগদাদ, বসরা, মসুল, কিরকুককে ধ্বংস করেনি, সাথে সাথে ধ্বংস করে দিয়েছে হাজার বছরের সভ্যতার অর্জন, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবতাবাদ, আর্ন্তজাতিক আইন, পঞ্চশীলা নীতি, জেনেভা কনভেনশান ইত্যাকার সুশীল মূল্যবোধের পিলসুজগুলোকে। প্রগতিশীল আধুনিক মানুষেরা যে বিষয়গুলো নিয়ে গর্ব করত, নিমিষেই তাদের সে গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। সভ্যতার সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হয়েছে এখানেই এবং এখান থেকেই বিশ্ব রাজনীতির নোতুন ভাবনা, নোতুন মেরুকরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। তবে ইরাক আগ্রাসন পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করতে হলে আরো একটি বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে; আর তাহলো Globalisation বা বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

গ্লোবালাইজেশান ঃ প্রেক্ষিত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াঃ

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইরাক দখল এবং ইতিপূর্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফগানিস্তানে হামলা এবং সে দেশে একটি শিখন্ডি সরকার স্থাপনের ঘটনার মর্ম (Essence) উপলব্ধি করতে হলে দেড় দশক ধরে World Bank, IMF এবং WTO কর্তৃক পরিচালিত গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্বায়নের মূল কথা হলো সব কিছু সবার জন্য উম্মুক্ত করে দাও। লক্ষ্য--বাজারে অবাধ প্রবেশের সুযোগ। সে সুযোগ-- বলাই বাহুল্য--অবারিত হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্যই। উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশ কিভাবে প্রতিযোগিতা করে বাজারে ঢুকবে ? তাছাড়া পশ্চিমা সাম্রজ্যবাদী দেশগুলো বিশ্বায়নের নামে অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর বাজার দখল করলেও তাদের বাজারে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা টিকই বহাল রেখেছে বিভিন্ন কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে। তারা তাদের দেশে শিল্প ও কৃষিতে ঠিকই ভর্তূকী দিচ্ছে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সেক্ষেত্রে ভর্তূকী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে। ফলতঃ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিগত দেড় দশক ধরে পরিচালিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অনুন্নত দেশ সমূহ আজ তাদের জাতীয় সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দিয়ে আরো গরীব ও নিঃস্ব হয়েছে। বিশিল্পায়নের ফলে সে সকল দেশে বেকারত্ব বেড়েছে প্রকট ভাবে। জনসেবা মূলক খাতগুলোর মালিকানা ব্যাক্তিখাতে হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে জনগণের দুর্ভোগ সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। একদিকে ধনী দেশগুলো আরো ধনী হয়েছে এবং গরীব দেশগুলোর দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে দেশগুলোর অভ্যন্তরেও ধনী দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র হয়েছে। এ গ্লোবালাইজেশনের আড়ালে বহুজাতিক কোম্পানী সমূহের একচেটিয়া পুঁজির দৌরাত্ম্য সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেছে। তেল গ্যাস হতে শুরু করে বিদ্যুৎ, রাবার, ক্যামিকেল, পেপার, ঔষধ, সিমেন্ট, খনিজ সর্বক্ষেত্রে বহুজাতিক একাধিক কোম্পানী এক একটি কোম্পানীতে একীভূত হয়ে এক একটি মেঘা কর্পোরেশনের জন্ম দিচ্ছে, যেগুলো অর্থনৈতিক দৈত্যরূপে বিশ্ব বাজারে আবির্ভূত হয়েছে। ব্যাংকগুলো একীভূত হয়ে একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির জন্ম দিচ্ছে। জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে নিকট অতীতে যে সকল বহুজাতিক কোম্পানী ব্যবসা করত তাদের মধ্যে ১০ টি কোম্পানীকে বলা হত Top Ten এবং তৎমধ্যে ৭টি কোম্পানীকে বলা হত " Seven Sister" যারা বিগত কয়েক দশক ধরে জ্বালানী তেলের ব্যবসায় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। কিন্তু এ সকল কোম্পানী সমূহ সম্প্রতি একীভূত হয়ে তিনটি মেঘা কর্পোরেশন --- Exxon/Mobil, Royal Dutch Shell এবং BP/Amoco হিসাবে জন্ম লাভ করেছে। এ তিনটি মেঘা কর্পোরেশনের যৌথ বিক্রয় অপর ১৬ টি কর্পোরেশনের যৌথ বিক্রয়ের চেয়ে বেশী। এ তিনটি মেঘা কর্পোরেশনের বৎসরে যৌথ বিক্রয়ের পরিমাণ ৪১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৯৫ কোটি মানুষের দেশ ভারতের বার্ষিক জিডিপিকে ছাড়িয়ে যায়। বিশ্ব অর্থনীতিতে এ পরিবর্তন বিশেষ ভাবে দৈত্যাকার মেঘা কর্পোরেশনের আবির্ভাব বিশ্ব রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তথাকথিত নিউ-গ্লোবালাইজেশন, উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোতে তার ধারাবাহিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আনুপূর্বিক ঘটনার ব্যাখ্যা করলে সহজে উপলব্ধি করা যাবে যে, ১৯৯১ ইং সালে ইরাকে মার্কিন হামলা, ২০০১ ইং সালে আফগানিস্তান দখল এবং সেখানে একটি শিখন্ডি সরকার বসানো এবং সর্বসম্প্রতি ইরাক দখল এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ সমূহের তেল গ্যাস কোম্পানী সমূহ deregulation এর নামে ব্যাক্তি খাতে হস্তান্তরের বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসক্রিপশান সবকিছুর কার্যকারণ অভিন্ন ও একইসূত্রে গাঁথা--সে মেঘা কর্পোরেশন তথা একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির স্বার্থ রক্ষা। আমদের জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস অসম উৎপাদন-বন্টন চুক্তির মাধ্যমে সেই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের হাতে তুলে দেওয়ার পাঁয়তারা এবং লাভজনক তেল বিপণন কোম্পানী সমূহ বিক্রি করে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের কার্যকারণও কিন্তু খুজঁতে হবে এখানেই। বিশ্বের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য ঐ সকল মেঘা কর্পোরেশনের স্বার্থের বরকন্দাজ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োজনে আরো দেশ দখল করবে এবং এ কাজে তার ছল ছুতোর কোন অভাব হবেনা। এ প্রসঙ্গে দঃ এশিয়া মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারম্যান ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল অতি সপ্রতি বাংলাদেশে তাদের এক প্রতিনিধি সভায় যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উলেখ করছি---"

the ominous shadow of the post Iraq war is creeping in our direction and the purpose of neo-imperialism is not confined to acquisition of oil source only but is also re-establish

years of hegemony. তিনি আরো বলেন--- It is time that we take our destiny in our hands and assert that no war will be fought on the soil of South Asia and the sacred soil of our ancient land will never witness the murder of innocents by the terrorist.(The Daily Star,27th April,03) অবশ্য এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে স্বয়ং আমেরিকার বক্তব্য পাওয়া গেছে। গত ২৮ শে এপ্রিল, ২০০৩, কাতারে আমেরিকার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড কোনরূপ রাখ ঢাক না করেই বলেছেন, "আমেরিকার রাজনীতি এখন এক নোতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, আমেরিকা এখন তার নিরাপত্তার জন্য হুমকী সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী দেশকে চিহ্নিত করে আগেই আক্রমণ করে পরাস্ত করবে (Preamtive War Theory) এবং আফগানিস্তান ও ইরাকের ক্ষেত্রে আমাদের এ নীতি অত্যন্ত সফল হয়েছ ।" বলাবাহুল্য এ নতুন যুগ হলো আমেরিকার সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। এখানে বার্তাটা অত্যন্ত পরিস্কার--আমেরিকা যখন যে দেশকে দখল করা প্রয়োজন মনে করবে, তাকে তার নিরাপত্তার জন্য হুমকী মনে করে দখল করে নিবে।

ইরাক আগ্রাসন ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

ইরাকে এ অনৈতিক, অযৌক্তিক ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী আগ্রাসনের পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে; তাৎক্ষনিক বা স্বল্প মেয়াদী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, সুদূরপ্রসারী বা দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়ার কোন্ ধারা মূলধারা হিসাবে প্রাধান্য পাবে তা নির্ভর করবে ধারার বাহকদের রাজনৈতিক শক্তি-ভারসাম্য ও সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী ভূমিকার উপর।

তাৎক্ষনিক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঃ

যে অজুহাত দেখিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখল করে নিল তা বহুল প্রচলিত সেই ঈশপের "নেকড়ে ও মেষশাবক" গল্পের মত--যে গল্পে নেকড়ের অভিযোগ, মেষশাবক স্রোতের উজানে থেকে নেকড়ের পানি ঘোলা করছিল বলে নেকড়ে তাকে খাবে। এক্ষেত্রেও অজুহাত বালাইষাট, ইরাককে দখল করতেই হবে। যে দেশ বিশ্বে প্রথম এবং একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারকারী দেশ, কোন দেশ মানব বিধ্বংসী অস্ত্র বানাচ্ছে কিনা সে দুশ্চিন্তায় তার ঘুম আসেনা। বিশ্ব মানবতার জন্য তার কি দরদ ! একেই বলে 'চোরের মার বড় গলা' কিংবা 'ভূতের মুখে রাম নাম'। বলা বাহুল্য, বিশ্বে সকল ক্ষুদ্র, দরিদ্র বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা খাতে দুর্বল দেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা আজ হুমকীর সম্মুখীন। যে কোন অজুহাতে শক্তিধর যে কোন দেশ তার দুর্বল প্রতিবেশীকে দখল করে নিতে পারে। ফলতঃ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে আজ বৃহৎ কোন শক্তির সাথে জোট বাঁধার চিন্তা করতে হবে, যা বিশ্বে নতুন মেরুকরনের জন্ম দেবে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা খাতে এসকল শঙ্কিত দেশগুলোকে ব্যয়বৃদ্ধি করতে হবে, যা তাদের জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশ্বায়নের চাপে এ সমস্ত দেশের সরকারগুলো আরো জাতীয় সম্পদ তেল গ্যাস বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে।

আমেরিকা কর্তৃক সর্বসাম্প্রতিক দু'টি মুসলিম দেশ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল এবং নতুন করে ইরান ও সিরিয়ার প্রতি হুমকী, মধ্যপ্রাচ্যে নগ্নভাবে ইসরাইলী স্বার্থের পাহারাদারী, মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলোর আমেরিকার কাছে নতজানু নীতি এবং ইরাকে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে কোন জোরালো অবস্থান নিতে না পারা বরং কুয়েত, সৌদি আরব, তুরস্ক কর্তৃক ইরাক হামলায় আমেরিকাকে সহযোগিতা প্রদান, বিশ্বের সাধারণ মুসলমানদের মনে যে নিদারুন ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম দিয়েছে, তা মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান ঘটানোর পথকে সুগম করতে পারে। ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে ইরাকের শিয়া সম্প্রদায়ের লক্ষ জনতা দখলদার আমেরিকা বাহিনীর বিরোধীতা করার সাথে সাথে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দাবী করে শ্লোগান দিচ্ছে। চুড়ান্ত পরিণামে ইরাকে ইরানের মত একটি ইসলামী সরকার গঠিত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায়না। ইরাক আগ্রাসন বস্তুতঃ মুসলিম সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক সন্ত্রাস জোরালো করার যৌক্তিক ভিত্তিভূমি তৈরী করে দিয়েছে। ফলতঃ মুসলিম প্রধান দেশে দেশে জঙ্গী মৌলবাদী রাজনৈতিক সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাবে এবং এ সন্ত্রাসের শিকার কেবল পশ্চিমা ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান হবেনা, সে সমস্ত দেশের প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীরাও এর নির্বিচার শিকারে পরিণত হবে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি ধ্বস নামতে পারে। সেখানের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্ত ঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে। এমনকি মধ্যেপ্রাচ্যে রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তনও ঘটতে পারে। আমেরিকার Satellite state হিসাবে সর্বাপেক্ষা ফায়দা লুঠার অবস্থানে থাকবে ইস্রাইল নামক রাষ্ট্রটি। ইরাকে দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত শিয়া-সুন্নী বিরোধ দখলদার বাহিনীর সুকৌশল ইন্দনে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলতেও পারে । গ্লোবালাইজেশান এর নামে দরিদ্র দেশগুলোর জাতীয় সম্পদ, বিশেষভাবে তেল গ্যাস লুন্ঠনের যে প্রক্রিয়া চলছে, তার হিস্যা নিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে, যার লক্ষণ ইতোমধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিশ্বে একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির দৌরাত্ম্য আরো দুর্নিবার হবে। ইউরোপে আমেরিকা বিরোধী নোতুন মেরুকরন ঘটবে, যা শেষ পর্যন্ত ইউরো-ডলার দ্বন্দ্বে রূপ নিয়ে বিশ্বকে আরো একটি মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সুদূরপ্রসারী এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াঃ

সাম্রাজ্যবাদের আদি চেহারায় প্রত্যাবর্তন ইতোমধ্যেই সারা দুনিয়াব্যাপী গণমানুষের অন্তরে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। আমেরিকার গ্রানাডা দখল, ১৯৯১ ইং সালে ইরাকে হামলা, ২০০১ ইং সালে আফগানিস্তান দখল এবং ভিয়েতনামে দীর্ঘদিনের দখলদারিত্ব, এসব কোন ঘটনাই বিশ্বব্যাপী কখনো এরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি এবং হামলাকারী আমেরিকা, বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের এত মানুষ প্রতিবাদে কখনো রাস্তায় নেমে আসেনি। তাই এ ঘটনা সারা বিশ্বব্যাপী গণমানুষের অন্তরে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের যেমন জন্ম দিয়েছে, তেমনি পাকিস্তান বাংলাদেশ সহ মধ্যপ্রাচ্যের শেখ শাসিত সকল মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর সাম্রজ্যবাদের কাছে আপোষকামী নতজানু চরিত্র তাদের জনগণের নিকট উম্মোচিত করে দিয়েছে। ডঃ মহাথির মোহাম্মদের মালেশিয়া ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর অনেক দেশের বেলায়ও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

ইরাক আগ্রাসন পরবর্তী সময়ে ইরাকের তেল কূপ নিয়ে কামড়াকামড়ি ইরাক আগ্রাসনের নটের গুরু যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে তাদেরই স্বার্থের বরকন্দাজ, সেটা বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে উম্মোচিত করে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, উন্নয়ন অগ্রগতির কোরাস শুণিয়ে তথাকথিত "নিউ লিবারেল গ্লোবালাইজেশনের" যে বড়ি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশ গুলোকে সেবন করানো হয়েছিল, মাত্র দেড় দশকে তার তিক্ত প্রতিক্রিয়ায় সে দেশগুলোর চেহারা ইতোমধ্যেই অর্থনৈতিক রক্তশূন্যতায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তাই সে সব দেশের গণমানুষ, বিশেষভাবে শ্রমজীবি মানুষ World Bank, IMF এবং WTO র এ প্রেসক্রিপশানের বিরুদ্ধে ক্রমে ফুঁসে উঠছে। ১৯৯৯ ইং সালে সিয়াটলে WTOএর সভার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রচন্ড প্রতিবাদ সারা বিশ্ব ব্যাপী গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে এবং তৎপরবর্তী World Bank, IMF এবং WTO র কোন সভা প্রতিবাদ বিক্ষোভ বিহীন হয়নি। ২০০১ ইং সালে জেনোয়াতে একজন প্রতিবাদকারী জীবন দিয়ে এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করে দিয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো গ্লোবালাইজেশনের নামে deregulation এর ফলাফল ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিদ্যুৎ, পানিসরবরাহ, স্বাস্থসেবা প্রভৃতি পাবলিক ইউটিলিটি খাত ব্যাক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে সে সমস্ত দেশে জনগণের দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বেকারত্ব সে দেশের গণমানুষকেও প্রতিবাদী করে তুলছে। বস্তুতঃ গ্লোবালাইজেশন, একচেটিয়া লগ্নিপুঁজির উদ্ভব, পুঁজিবাদেরই অনিবার্য পরিণতি (Most natural culminating phenomenon in the capitalist economic order)। অতএব নোতুন অর্থনৈতিক বিকল্প হিসাবে আবারও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথাটি সামনে চলে আসে; যদিও বিদ্যমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তার রূপ-কাঠামো নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এভাবে সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য উন্নয়শীল ও অনুন্নত দেশগুলোর ভূমি ক্রমে উর্বর হচ্ছে। বিষয়গত অবস্থা (Objective condition) তৈরী হয়েই আছে । ঘটনা প্রবাহের গতিধারা, সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করবে পরিবর্তন প্রয়াসী শক্তির রাজনৈতিক শক্তি-ভারসাম্যের উপর। অর্থাৎ বিষয়ীগত অবস্থার (Subjective condition) বিকাশের মাত্রার উপর। এ ক্ষেত্রে যেখানে প্রশ্নটি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের, সেখানে বিপ্লবের প্রশ্নটিও সামনে আসে, যার সম্ভাব্যতা ও সফলতা নির্ভর করবে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিপ্লবী শক্তির প্রস্তুতির উপর। তবে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বের দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষিতে অনুপস্থিত । কিন্তু বাম প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির সমন্বয়ে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি যে পূর্বাপেক্ষা উর্বর হয়ে আছে, বিশেষভাবে আমাদের বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলোতে, সেকথাটি জোর দিয়ে বলা যায়।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ঃ

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ জন্মলাভ করে । প্রথমতঃ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ জিও-পলিটিক্যাল কারনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অনুকুল ছিলনা। তাই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবদমনের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌ-বহর প্রেরণ করেছিল। অস্ত্র দিয়ে, কুটনৈতিক সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে সমর্থন ও সাহস যুগিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিকভাবে অধনবাদী বিকাশের যে পথ সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ গ্রহণ করে, তা সাম্রাজ্যবাদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিলনা। যে কারণে ১৯৭৫ ইং সালে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে যে বিয়োগান্তক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে, তার পশ্চাতে যে মার্কিন সাম্রজ্যবাদের সংশ্লিষ্টতা ছিল তা আজ কম বেশী স্বীকৃত। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর অর্থনৈতিক বিকাশের যে অধনবাদী পথ গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরিত্যাক্ত হলো। পক্ষান্তরে ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণের মাধ্যমে নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খলে দেশের অর্থনীতিকে আবদ্ধ করে

দেশকে বহুজাতিক কোম্পানীর লীলা ভূমিতে পরিণত করা হল । রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলা হল। জাতীয়করনকৃত শিল্প কারখানা ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা হল। উপযুক্ত জামানত ছাড়াই হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করা হতে লাগল। ১৯৭৫ থেকে ২০০৩ইং পর্যন্ত সকল সরকারের আমলেই এ ধারা অব্যাহত থাকল। ৯০ এর দশকে এসে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির পালে জোর বাতাস লাগল। এহেন বৈরী বিশ্ব পরিস্থিতিতে যারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করার লক্ষ্যে শিল্প কারখানা জাতীয়করন এবং ভূমি মালিকানার শিলিং নির্ধারন করেছিল তারাও যেন অতীতে ভুল করেছি ভেবে লজ্জায় মুখ লুকাতে লাগল। ৯০ এর দশক থেকে শুরু হওয়া গ্লোবালাইজেশন এবং নিউ-লিবারেলাইজেশন এর প্রেক্ষিতে দাতা গোষ্ঠীর প্রেসক্রিপশানে যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হলো তারাই জাতীয়করনকৃত শিল্প কারখানা নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দিতে লাগল। ভূ-গর্ভস্থ আমাদের জাতীয় সম্পদ গ্যাস অসম চুক্তির মাধ্যমে বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে লাগল। ১১টি ব্লকে ভাগ করে গ্যাস ক্ষেত্র বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে ইজারা দেওয়া হলো অসম পি,এস,সি চুক্তির মাধ্যমে। গ্যাসের প্রকৃত মজুদ নিশ্চিত না হয়ে গ্যাস রপ্তানীর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। এসবের চুড়ান্ত ফলাফল কি দাঁড়াল ?

হস্তান্তরিত পাঁচ শতাধিক শিল্প কারখানার মধ্যে ৬০% শিল্প কারখানা বিলুপ্ত হয়ে গেল। বাকী গুলোর অর্ধেকের ও বেশী রুগ্ন হয়ে পড়ল। হাজার হাজার কোটি টাকা যারা ঋণ নিল তারাও কোন শিল্প কারখানা গড়ে তুললনা। বরং ৪৪ হাজার কোটি টাকা খেলাফী ঋণ হিসাবে তারা আত্মসাৎ করে বসল। Spoon feeding করার পরও যেখানে ব্যক্তি খাতে শিল্প কারখানার বিকাশ ঘটলনা, সেখানে দেশের স্পর্শকাতর তেল ও গ্যাস সেক্টরের শিল্প কারখানাগুলো বিরাষ্ট্রীয়করনের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার পাঁয়তার অব্যাহত থাকল। যে সাম্রজ্যবাদ তেল সম্পদ দখলের জন্য ইরাকে আগ্রাসন চালাল, আমাদের অর্থনীতি সে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ হয়ে পড়ল। আমাদের বর্তমান সরকার সাম্রাজ্যবাদের কাছে এত নতজানু যে, ইরাক আগ্রাসনের মত এমন একটি অনৈতিক ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী ঘটনার বিরুদ্ধে সংসদে একটি নিন্দা প্রস্তাবও নেওয়ার সাহস দেখাতে পারলনা । ভারতের হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি সরকার যা পেরেছে, আমাদের মুসলিম মৌলবাদী ও তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদর ককটেল সরকারও তা পারলনা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বর্তমান বিরোধী দলের ভূমিকাও ছিল আপোষকামী ও দায়সাড়া গোছের। কিছু ইসলামী মৌলবাদী দল ও গোষ্ঠীর বাদ প্রতিবাদের কারণ ছিল মুসলমানদের উপরে অমুসলিমদের হামলা। অর্থাৎ তাদের প্রতিবাদ যত জোরালো হউকনা কেন, সেখানে মৌলিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার পরিবর্তে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই ছিল মুখ্য। তবে তাদের সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভে বোধগম্য কারণে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানের বিপুল অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে কিন্তু ধর্ম-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশের একটি শঙ্কারও উদ্ভব হয়েছে, যার আলোচনা আমরা বিশ্বপ্রেক্ষিতে করেছি। বাম সংগঠন গুলো এবং বাম ও উদার গণতান্ত্রিকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ১১ দলীয় জোট এবং দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক কিছু সংগঠনের ভূমিকা ছিল সঠিক অর্থে সাম্রজ্যবাদ বিরোধী; তবে তা কাঙ্খিত মাত্রায় জোরালো হতে পারেনি। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন, গ্লোবালাইজেশন ও নিউ লিবারেলাইজেশন এর প্রেক্ষিত ও তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আলোচনা থেকে যে বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে উঠে, তাহলো গ্লোবালাইজেশন ও নিউ লিবারেলাইজেশনের আর্থ-চক্রতন্ত্রের(Financial oligarchy) বিপরীতে জাতীয় সম্পদ সমাবেশ ঘটিয়ে, বিদেশ নির্ভরতা পরিহার করে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী স্বাধীন ও স্বকীয় অর্থনৈতিক বিকাশের কর্মসূচী গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুন্নত অপরাপর দেশের মত বাংলাদেশের পক্ষেও জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবেনা। কেবল মাত্র সাম্রজ্যবাদ বিরোধী দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার সম্পন্ন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে এ কাজটি করা সম্ভব । আমাদের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো, ক্ষমতার জন্য যারা সাম্রজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে কুণ্ঠিত হয়না, তারা ইতোমধ্যেই এ পরীক্ষায় ফেল মেরেছে এবং ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তাদের সাম্রাজ্যবাদ তোষণ নীতিকে জনগণের সামনে উম্মোচিত করে দিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক আগ্রাসনের মাধ্যমে ন্যূনপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক উদার গণতান্ত্রিক ও বাম জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য ও বিকাশের একটি উর্বর ভিত্তিভূমি তৈরী করে দিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। বাম প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক, সর্বোপরী দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি, যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে বহুদা বিভক্ত হয়ে আছেন, তাদের বিষয়টি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে অনতিবিলম্বে। কারণ ইরাক আগ্রাসন উত্তর বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ঠেকানো এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশকে কাঙ্খিত উন্নয়ন অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সম্ভবতঃ তারাই শেষ ভরসা।

পুনশ্চ ঃ আমার এ নিবন্ধটি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক দখলের পর ৩রা মে, ২০০৩ এ এক সেমিনারের জন্য লেখা। তাই তখন যে সকল সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করেছিলাম তা আজ তিন বছর সময়ের নিরিখে পরীক্ষা করে দেখা যায়। ইরাক দখলের তিন বছর পার হয়ে গেলেও ইরাকী জনগণের একটি অংশ এখনো দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত। প্রতিদিন কিছু না কিছু দখলদার বাহিনীর সৈন্য মারা পড়ছে––যার সংখ্যা ইতোমধ্যে কয়েক হাজার ছাড়িয়ে

গেছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি বস্তুত আজ ইরাকে রাজনীতির এমন এক চোরাবালিতে আটকা পড়েছে, যেখান থেকে সহজে বের হতে পারছেনা। পাশাপাশি ইরাকে আজ চলছে শিয়া সুন্নীর আত্মঘাতি লড়াই। এ লড়াইয়ের ফলাফল যে ইরাকের দ্বিধা বিভক্তির মধ্যে শেষ হবেনা তাকি জোর দিয়ে বলা যাবে ? ইরাকের রাজনীতি আজ যেভাবে ধর্মীয় মোল্লাদের কব্জায় চলে গেছে তাতে যদি কোনদিন দখলদার বাহিনী প্রত্যাহৃতও হয় ইরাক যে এক বা একাধিক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে তা বুঝার জন্য কোন পাণ্ডিত্যের দরকার পড়ে কি?

সর্বোপরি ইরাক দখলের প্রতিক্রিয়ায় আজ সারা বিশ্বে মৌলবাদের যে বাড়বাড়ন্ত--যার নির্মম শিকার আজকের বাঙলাদেশ ও দেশের প্রগতিশীল জনগোষ্ঠী--তা থেকে বিশ্ববাসী কি সহজে মুক্তি পাবে?

বক্ষ্যমান নিবন্ধটি বিগত ৬ই মে, ২০০৩ ইং তারিখে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ হিসাবে উপস্থাপিত।

** মোহাম্মদ জানে আলম*
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।
ও সভাপতি
বাংলাদেশ অয়েল এ্যান্ড গ্যাস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
E-mail—jalamadv@ yahoo.com

তথ্য সূত্রঃ ইন্টারনেট

1.ICEM documents, by Vic Thorpe, ICEM, Brussels.
2.The 3rd Oil War, Geology and Geopolitics, by Tushar K Sarkar
3.People's movement and alternative, by Sukomal Sen.
4.Blood Thirsty War for Iraq's Oil, Dr. M.K.Pandhe. General Secretary, CITU, New Delhi.
5. Energy Reserves, Refining and Technology, Prospect and challanges,
by Swadesh Dev Roye, Secretary, CITU. New Delhi.